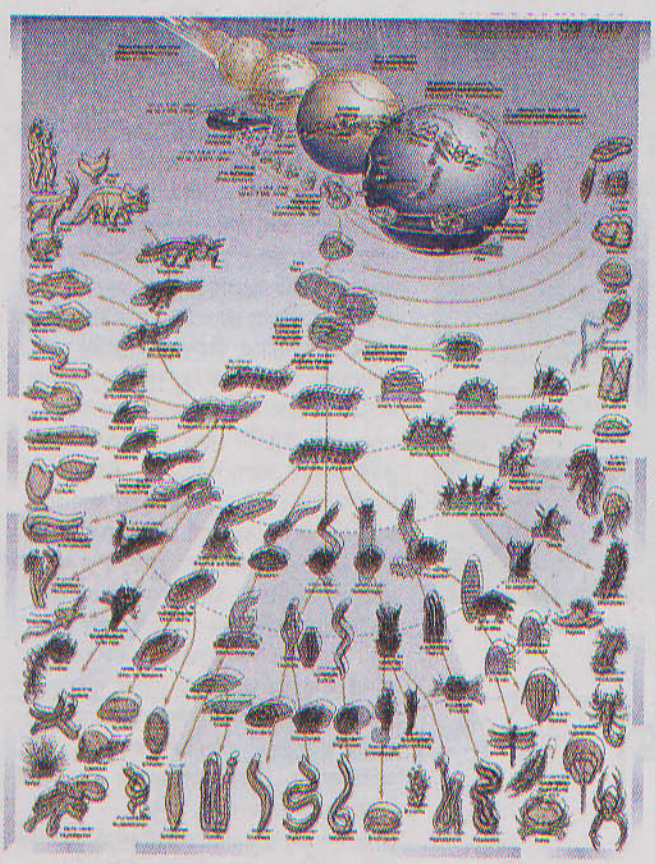

বিবর্তন সম্পর্কে প্রচলিত ভুল ধারণাগুলো

বন্যা আহমেদ

খুব সহজবোধ্য কারণেই সাধারণ মানুষের মধ্যে আজ আমরা বিবর্তনবাদের বিরুদ্ধে এতো বিরোধিতা ও ভুলভ্রান্তি দেখতে পাই। ছোটবেলা থেকে আমরা সৃষ্টিতত্ত্বের সব রকমের ব্যাখ্যা পড়ে-শুনে বড় হলেও বিবর্তনবাদের মতো বিজ্ঞানের মূল একটি তত্ত্বকে আমাদের পাঠ্যসূচি থেকে সযতনে এড়িয়ে যাওয়া হয়। আর তার সাথে যদি যুক্ত হয় সুচিন্তিতভাবে আরোপ করা রাজনৈতিক, সামাজিক বিরোধিতা তাহলে তো কথাই নেই। আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতেই নয় আমেরিকার মতো অগ্রসরমান দেশেও আজকে বিবর্তনবাদের মতো প্রতিষ্ঠিত একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের কোনো শেষ নেই। এখানকার প্রেসিডেন্ট বিনা দ্বিধায় ঘোষণা দেন যে, 'ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন' নামের পুরনো ধর্মীয় সৃষ্টিতত্ত্বকে যেনো বিবর্তনবাদের বিকল্প হিসেবে বিজ্ঞানের ক্লাসে পড়ানো হয়। আমেরিকার সংবিধান অনুযায়ী সরকারি স্কুল-কলেজে ধর্মবিষয়ক কোনোরকম শিক্ষা নিষিদ্ধ বলে গণ্য করা হয়; কিন্তু তারপরও এভাবে তারা ধর্মীয় সৃষ্টিতত্ত্বকে স্কুল-কলেজের পাঠ্যসূচিতে ঢুকিয়ে দেয়ার পায়তারা করে যাচ্ছেন। এ নিয়ে সচেতন জনগোষ্ঠী স্কুল বোর্ডগুলোর এধরনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোর্ট-কাচারিতে মামলাও করে ছাড়ছেন এবং এখানকার বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং সামাজিক সচেতনার কারণে এখন পর্যন্ত প্রত্যেকটি মামলার ফলই ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনদের বিপক্ষে গেছে। তাহলে বোঝাই যাচ্ছে যে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিবর্তনবাদের বিরোধিতাটা শুধু একটা বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার তা নয়, এর পেছনে খুব শক্তিশালী সামাজিক এবং রাজনৈতিক ভিত্তিও কাজ করছে। স্কুলের পাঠ্যসূচিতে এই সৃষ্টিতত্ত্বকে বিবর্তনের পাশাপাশি 'বিজ্ঞান' হিসেবে সৃষ্টিতত্ত্ব পড়ানোর দাবি তো আছে, সেই সাথে আছে প্রচলিত পত্র-পত্রিকা, ধর্ম-প্রতিষ্ঠান, প্রতিপত্তিশালী সামাজিক এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিদের বিবর্তন সম্পর্কে ভুল ধারণা প্রচার করার অনবরত প্রচেষ্টা।

বিজ্ঞানীরাও এখন অনেকে স্বীকার করেন যে, তারা শুধু এতোদিন গবেষণা এবং বৈজ্ঞানিক কাজকর্ম নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন, সাধারণ মানুষকে বিবর্তন সম্বন্ধে অবগত করানোর বা বোঝানোর গুরুদায়িত্ব তারা পালন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তাই এখন রিচার্ড ডকিন্স থেকে শুরু করে কেনেথ মিলার, টিম বেড়া, ডগলাস ফুটুইমা, আর্নেস্ট মায়ার (প্রয়াত) মতো বিখ্যাত জীববিজ্ঞানীরা কার্ল সাগানের পথ ধরে বিজ্ঞানকে বিশ্বজুড়ে সাধারণ মানুষের দরজায় পৌঁছে দেয়ার কাজে লিপ্ত হয়েছেন।

বিজ্ঞানীরা বিবর্তনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এখন একমত হতে পারেননি; কিন্তু গত একশ' বছর ধরে বিবর্তনবাদের মূল বিষয়বস্তু অর্থাৎ সব জীবই যে সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে উৎপন্ন হয়েছে, তা নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। আজকে পৃথিবীর গোলত্ব বা সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবী ঘুরছে এগুলো যেমন প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, বিবর্তনবাদও ঠিক তেমনি একটি সুপ্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। ড. ডগলাস ফুটুইমা তার Evolution বইতে দুঃখ প্রকাশ করে বলেছেন যে, আজকে ৪০ শতাংশের বেশি আমেরিকান বিবর্তনতত্ত্বে বিশ্বাস করে না, তারা মনে করেন সৃষ্টিকর্তা সরাসরিভাবে মানুষ তৈরি করে এই পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু ইউরোপের বেশির ভাগ মানুষই বিবর্তনবাদকে মেনে নিয়েছেন, তারা নাকি অবাক হয়ে যায় শুনে যে, আমেরিকার মতো বৈজ্ঞানিকভাবে অগ্রসরমান এমন একটা দেশে কি করে বিবর্তনবাদ সম্পর্কে এতো বৈজ্ঞানিক ধারণা এখনও টিকে থাকতে পারে। ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সাময়িকীর ২০০১ সালে সমীক্ষা অনুযায়ী প্রায় ৪৫ শতাংশ আমেরিকান যে শুধু বিবর্তনের অবিশ্বাস করে তাই নয়, তারা এখনও মনে করে যে মানুষ এই অপরিবর্তিত রূপেই ছয় হাজার বছর আগে ঈশ্বর কর্তৃক পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছিল। তবে প্রায় ৩৭ শতাংশ মনে করেন যে, ঈশ্বর প্রাথমিকভাবে জীবন তৈরি করলেও তারপর বিবর্তনের মাধ্যমেই সব জীবের উদ্ভব ঘটেছে। বাইবেলের ধারণা অনুযায়ী অনেকে এখনও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, ছয় হাজার বছর আগেই পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছিল এবং সাড়ে ছয় কোটি বছর আগের ডায়নোসরের অস্তিত্ব আজগুবি গল্প ছাড়া আর

কিছুই নয়। ইন্টারনেটে সার্চ দিলে এরকম হাজার হাজার সাইট খুঁজে পাবেন। এধরনের ধর্মীয় মৌলবাদীরা পুরোপুরিভাবেই বিবর্তনবাদকে অস্বীকার করেন। হারুন ইয়াহিয়া বলে তুর্কি এক সঘোষিত বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক তার The Evolution Deceit বইতে বিবর্তনবাদের বিরোধিতা করে বলেছেন যে, বিবর্তনবাদ আজকে পৃথিবীর আধিপত্যবিস্তারকারী শক্তির দ্বারা তৈরি এক ধরনের প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে অনেকেই আছেন যারা বিজ্ঞানের এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শাখাটি সম্পর্কে জানতে আগ্রহী; কিন্তু এখান থেকে, সেখান থেকে শুনে বিবর্তনবাদ সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করেন। আমাদের দেশের স্কুল-কলেজের বিজ্ঞানের পাঠ্যসূচিতে যেহেতু পরিষ্কারভাবে বিবর্তনবাদ পড়ানো হয় না, তাই অনেকেই আবার ইন্টারনেটের সৃষ্টিতত্ত্ববাদী বিবর্তনবিরোধী সাইটগুলো থেকে তথ্য জোড়ার করে বেশ জোরেসোরে বিবর্তবাদের বিরোধিতা করতে শুরু করে দেন। আসলে বিবর্তনতত্ত্ব হচ্ছে জীববিদ্যার সব শাখার অন্যতম ভিত্তিমূল, একে ছাড়া জীববিদ্যাই অচল হয়ে পড়বে। বাজারে বিবর্তনবাদের ওপর পৃথিবীর নামকরা সব বিজ্ঞানীদের লেখা হাজারো বই রয়েছে, তাদের কোনো একটি বই একটু মনোযোগ দিয়ে পড়লেই কিন্তু বেশির ভাগ ভুল ধারণাগুলো কেটে যায়; কিন্তু এতোটুকু কষ্টই বোধহয় অনেকের আর করে ওঠা হয় না। মজার জিনিস হচ্ছে, ডারউইন এবং ওয়ালেস বিবর্তন তত্ত্বটি দেয়ার পর বেশির ভাগ মানুষই এর বিরোধিতা করেছিলেন; কিন্তু গত দেড়শ' বছরে বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতির ফলে এখন তারা আর পুরোপুরিভাবে একে অস্বীকার করতে পারেন না, তাই যারা এ সম্পর্কে অল্প-সল্প খবর রাখের তারা অনেকেই বলেন যে, মাইক্রো বিবর্তন ঘটলেও ঘটতে পারে তবে বিবর্তন নাকি একটি অসম্ভব ব্যাপার।

বিবর্তনবাদ শুধুই একটি তত্ত্ব এর মধ্যে কোনো বাস্তবতা বা সত্যতা নেই : এধরনের কথা যারা বলেন তাদের কাছে বোধহয় তত্ত্ব এবং বাস্তবতার মধ্যে পার্থক্যটা ঠিক পরিষ্কার নয়। চলুন প্রথমে না হয় সেটাই একটু পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করা যাক। কোনো পর্যবেক্ষণ যখন বারংবার প্রমাণিত হয় তখন তাকে আমরা বাস্তবতা বা সত্য বলে ধরে নেই। আর এদিকে তত্ত্ব হচ্ছে এই বাস্তবতা, প্রাকৃতিক নিয়ম বা পরীক্ষিত কোনো প্রকল্প কিভাবে ঘটছে সেই প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা। যেমন ধরুন, আপেল কেন মাটিতে পড়ে তা নিউটনের মহকার্ষ সূত্র দিয়ে তা খুব ভালোভাবেই ব্যাখ্যা করা যায়। এখানে আপেল পড়ার ব্যাপরটা হচ্ছে বাস্তবতা। আর নিউটনের মহাকর্ষের সূত্র, যা দিয়ে এই আপেল পড়ার প্রক্রিয়াটাকে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে তা হলো তত্ত্ব। দেখা গেল এই মহাকর্ষ তত্ত্ব খুব ভালোভাবেই বাস্তবতাকে ব্যাখ্যা করছে; কিন্তু আইনস্টাইন এসে দেখালেন যে নিউটনের মহাকর্ষ নিয়ম কিছু বিশেষ পরিস্থিতিতে সঠিক ফল দেয় না। এধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব হচ্ছে কখন? যখন বস্তুকণা ছুটতে থাকে আলোর বেগের কাছাকাছি কিংবা যেসব জায়গায় মহাকর্ষ বলের প্রভাব খুব বেশি (যেমন ব্ল্যাক হোলের কাছাকাছি)। দেখা গেল যে, এসব পরিস্থিতিতে নিউটনের মহাকর্ষসূত্রের চেয়ে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার ব্যাপক তত্ত্ব আরো নিখুঁত ফলাফল দেয়। শুধু তাই নয়, এইতো সেই দিন বহুলভাবে স্বীকৃত বিজ্ঞানের সাময়িকী Discover-এর আগস্ট ২০০৬

সংখ্যায় দেখলাম মোর্ডেহাই মিলগ্রম (Mordehai Milgrom) নামের এক বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের তত্ত্বকেও চ্যালেঞ্জ করেছেন, কারণ মোর্ডেহাইয়ের তত্ত্বে আইনস্টাইনের সেই রহস্যময় 'ডার্ক ম্যাটার'-এর ধারণা গ্রহণ করার দরকার পড়ে না। তাহলে কি আমরা বলবো, যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিউটনের (বা আইনস্টাইনও যদি কখনও ভুল প্রমাণিত হয়) মহাকর্ষের সূত্রকে ব্যাখ্যা করেছিলেন তা ভুল প্রমাণিত হয়েছে বিধায় গাছ থেকে আপেল পড়া বন্ধ হয়ে গেছে নাকি আপেলগুলো গাছের ডাল এবং মাটির মাঝামাঝি শূন্যে ঝুলে রয়েছে? 'আপেল পড়ার' বাস্তবতা তো আর নিউটন বা আইনস্টাইনের তত্ত্বের উপর নির্ভরশীল হয়ে বসে নেই। বিজ্ঞান তো স্থবির নয়, বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা থেকে পাওয়া সাক্ষ্যগুলোর চুলচেরা ক্রম-বিশ্লেষণের পরেই এরকম তত্ত্বগুলো হাজির করা হয়। যে তত্ত্বটি সবচেয়ে ভালোভাবে বাস্তবতাকে এ মুহূর্তে ব্যাখ্যা করতে পারছে সেই তত্ত্বটিকেই গ্রহণ করা হয়। তারপরও যদি দেখা যায়, এর চেয়ে আরও ভালো বিশ্লেষণ পরবর্তীকালে পাওয়া যাচ্ছে, তখন বিজ্ঞানের নিয়মানুযায়ীই যথাযথ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন ব্যাখ্যাটাকে গ্রহণ করা হয়। বিজ্ঞান এভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যায়, নতুন নতুন এবং উন্নতর তত্ত্বের মাধ্যমে বাস্তবতাকে বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে বিজ্ঞানের অগ্রগতি ঘটতে থাকে। এদিকে আবার কিছু বাস্তবতা বা সত্য আছে যা চোখের সামনে সরাসরি দেখা যায় না; কিন্তু প্রতিবারই তাকে পরোক্ষভাবে প্রমাণ করা সম্ভব, যেমন ধরুন পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে বা অণু পরামাণুর গঠন ইত্যাদি; কিন্তু এরা যে বাস্তব তা নিয়ে তো সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। বিবর্তনের ক্ষেত্রেও একই কথাই প্রযোজ্য। এটি একটি বাস্তবতা যে, জীব স্থির নয় বরং বিবর্তনের মাধ্যমে তাদের পরিবর্তন ঘটে আসছে, তাদের কাউকেই পৃথক পৃথকভাবে তৈরি করা হয়নি, তারা সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে বিবর্তন বা পরিবর্তনের মাধ্যমে উৎপন্ন হয়েছে। এই বাস্তবতাটি গত দেড়শ' বছর ধরে বারবার হাজারো রকমকভাবে প্রমাণিত হয়েছে। তবে, কিভাবে কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই বিবর্তন ঘটছে, কোন তত্ত্বের মাধ্যমে এই বিবর্তন প্রক্রিয়াকে সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গভাবে প্রমাণ করা যাবে তা নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে এখনও বিতর্ক চলছে। ডারউইন নিজেও এই দুটো বিষয়কে আলাদা করে উপস্থাপন করেছিলেন। 'The Descent of Man' বইটিতে তিনি পরিষ্কারভাবে বলেন যে, এখানে তিনি দুটো পৃথক বিষয় নিয়ে আলোচনা করছেন।

প্রথমটি হচ্ছে যেকোনো প্রজাতিকেই পৃথকভাবে তৈরি করা হয়নি, প্রকৃতিতে বিবর্তনের মাধ্যমে নতুন নতুন প্রজাতির উদ্ভব ঘটে আর দ্বিতীয়ত, প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে প্রধানত এই পরিবর্তন ঘটে থাকে। তিনি এই বলেও সাবধান করে দেন যে, যদি তিনি ভুলবশত প্রাকৃতিক নির্বাচনের ওপর অত্যাধিক জোর দিয়েও থাকেন তবু তার মাধ্যমে অন্তত পক্ষে এটুকু প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন যে, প্রজাতির পৃথক পৃথক সৃষ্টির মতবাদটি অন্ধবিশ্বাস ছাড়া আর কিছুই নয়। সৃষ্টিতত্ত্ববাদীরাই দাবি করেন যে, যেহেতু বিজ্ঞানীরা নিজেরাই এখনও বিবর্তন নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করে যাচ্ছেন, তা থেকে নাকি প্রমাণিত হয় বিবর্তনবাদের কোনো ভিত্তি নেই'। আবারও একই কথা বলতে হয় এর উত্তরে। বিজ্ঞানীরা বিবর্তন কিভাবে ঘটছে অর্থাৎ বিবর্তনের প্রক্রিয়া নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হলেও বিবর্তনবাদের মূল বিষয়বস্তু অর্থাৎ 'বিবর্তন আদৌ ঘটছে কিনা' তা নিয়ে একবারও সন্দেহ প্রকাশ করেন না। কারণ বিবর্তনের বাস্তবতা অনেক আগেই সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে, এখন বিতর্ক চলেছে বিবর্তনের প্রক্রিয়া নিয়ে। যেমন ধরুন, প্রাকৃতিক নির্বাচন যে বিবর্তনের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া তা নিয়ে কিন্তু বিজ্ঞানীদের মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই; কিন্তু এখন প্রশ্ন হচ্ছে এটিই কি একমাত্র বা প্রধানতম কারণ নাকি এমন অনেক জেনেটিক বা বংশগতীয় পরিবর্তন থাকতে পারে যারা প্রাকৃতিক নির্বাচনের আওতাভুক্ত না হয়েই বিবর্তন ঘটাতে পারে কিংবা আসলেই কি বিবর্তন শুধুমাত্র ধীর পরিবর্তনের মাধ্যমে ঘটে, নাকি কোনো সময় তার এই গতিতে উল্লম্ফনও ঘটতে পারে। বিজ্ঞানের চোখ দিয়ে বিচার করলে এই বিতর্কগুলোকে অত্যন্ত সুস্থ এবং বৈজ্ঞানিক বলেই ধরে নিতে হবে। এর মাধ্যমেই হয়তো একদিন আমরা সুস্পষ্টভাবে বলতে পারবো ঠিক কোন কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিবর্তন ঘটছে; কিন্তু সৃষ্টিতত্ত্ববাদীরা যখন একে পুঁজি করে বিবর্তনবাদের দুর্বলতা খুঁজতে থাকেন তখন তাদের উদ্দেশ্য নিয়ে সন্দিহান না হয়ে পারা যায় না।

লেখক : সিস্টেম এনালিস্ট, আটলান্টা, ইউএসএ